অধ্যায় ১২

ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে

এই অধ্যায়ে নিম্নোক্ত ছয়টি শিরোনামে মণ্ডলীর বিস্তৃত সামাজিক অংশগ্রহণের উপর বিশপগণের ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে : (১) সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ও পরিধি, (২) ভিতর থেকে পরিবর্তনশীল সমাজ, (৩) জনগণকে আত্মসচেতন ও সংগঠিত করা, (৪) নাগরিক সংগ্রাম ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ, (৫) কাজেই কি করা উচিত ?, এবং (৬) প্রাসঙ্গিক সামাজিক অংশগ্রহণের একটি সংক্ষিপ্তসার।

যোসেফ মাতামের এই অনুচ্ছেদটি এ অধ্যায়ের একটি ভাল ভূমিকা হিসেবে কাজ করতে পারে : আমাদের সামাজিক অংশগ্রহণে, আমরা একই লক্ষ্যে নিবেদিত সকল মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা কামনা করি। তাই, অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা ও সংলাপ গুরুত্ব বহন করে এতটাই যে, অতীতে এটা যথেষ্টরূপে উপলব্ধি করা হয়নি। আমাদের বুঝতে হবে যে, শুধুমাত্র আমরাই মানবসত্ত্বা এবং প্রেম ও সহভাগিতার মানব সমাজ নিয়ে চিন্তিত নই। আজকে আমাদের প্রেরণদায়িত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য দিক হল এমন মনোভাবাপন্ন লোকদের খুঁজে বের করা ও তাদের সঙ্গে হাত মেলানো।

১। সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ও পরিধি

বিশপগণ নানাভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেছেন। প্রথমত, তারা প্রায়শ অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা সম্পর্কে বলেছেন, যার লক্ষ্য হবে বিভিন্ন বিষয় একসাথে মোকাবেলা করা এবং সামাজিক রূপান্তরসাধনে কাজ করে যাওয়া। দ্বিতীয়ত, তারা আরও গুরুত্বারোপ করেছেন জনগণের অংশগ্রহণের উপর এবং (শুধুমাত্র তাদের জন্য নয় কিন্তু) তাদের সঙ্গে কাজ করার উপর, আর এইভাবে আজকের সমস্যাদির মোকাবেলায় তাদের ইতিবাচক অবদান স্বীকার ক'রে নেওয়ার উপর। তৃতীয়ত, কিছু কিছু জায়গায় তারা উল্লেখ করেছেন যে, দরিদ্র, যুব বা নারী নির্বিশেষে জনগণ নিজেরাই হচ্ছেন উন্নয়ন, মুক্তি ও সামাজিক পরিবর্তনের কর্মী।

বিষয়টি বুঝতে কিছু দিক আমাদের সাহায্য করবে। বিশপগণ ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বলেছেন : একটি ন্যায় সমাজ প্রতিষ্ঠায় সমগ্র খ্রীষ্টীয় সমাজ বিজড়িত, যারা সকল সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে সহযোগিতায় কাজ করবে। (এটা এটাই নির্দেশ করে যে, ন্যায্যতার জন্য কাজ করাই হল, সকল মানুষের আহ্বান !) সুতরাং, আমাদের ধর্মপল্লী, প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের উচিত, অপরাপর সংস্থা ও অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে সহযোগিতায়, নৈতিক মূল্যবোধগুলোর বিস্তার ঘটানো। সর্বোপরি ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ ঘোষণা করেছেন যে, আশার, মানব মর্যাদা ও সমতার এবং স্বাধীনতা, ন্যায্যতা ও স্থায়ী শান্তির একটি ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে খ্রীষ্টানদের অবশ্যই শুভবোধসম্পন্ন সকল নারী ও পুরুষের সঙ্গে একত্রে সর্বান্তকরণে কাজ করতে হবে। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে তারা আরও ঘোষণা করেছেন, একটি ন্যায়, মানবীয়, অংশগ্রহণধর্মী ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের উচিত অন্যান্য ধর্মের ভাই ও বোনদের সঙ্গে হাত মেলানো।

বিশপগণের ভাবনা অনুসারে, সহযোগিতার পরিধি সত্যি সত্যিই ব্যাপক। বাস্তবিকপক্ষে, বিশপগণ এ লক্ষ্যে খ্রীষ্টানদের সকল মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন : উন্নয়ন ও মুক্তি, এমনকি জাতীয় সংহতি

প্রতিষ্ঠা করা, আইনী সহায়তা প্রদান করা, একটি প্রেমের সংস্কৃতি গড়ে তোলা, দুর্বল শ্রেণীর অনুকূলে পরিস্থিতির পরিবর্তন, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করা, দুর্নীতির

বাক্স নং ১২/১

কাদের জন্য ভারতীয় মণ্ডলী ?

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ধর্মতাত্ত্বিক সংঘের এক সভায়, আলউইন ডি'সুজা এক চিন্তা-জাগানো বক্তৃতায় যুক্তিতর্কের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় মণ্ডলী বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এ মণ্ডলী অনেক সময় মূলতঃ এগুলোর পক্ষাবলম্বন করে। Gerwin van Leeuwen মন্তব্য করেছেন, ভারতে বিদ্যমান জাত ও শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে, বাকশক্তির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সে তার দরিদ্রদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক ভালবাসা ঘোষণা করলেও, জগতে একটি সংগঠিত সংগঠন হিসেবে মণ্ডলী আসলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শ্রেণী ব্যবস্থা ও ক্ষমতাসীনদের সমর্থন যোগায়। সভার বিবৃতি এ ধরনের ধারণার উপর আলোকপাত করে এটা উল্লেখ ক'রে যে, ধর্মব্রতীরা অনেক সময় কর্তৃত্বশীল শ্রেণীর স্বার্থ ও মূল্যবোধের সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু Gerwin van Leeuwen যেমনটি উল্লেখ করেছেন, মণ্ডলীর আত্মনিবেদন হবে দরিদ্রদের জন্য এবং গণ-আন্দোলনের জন্য। এ মণ্ডলীর উচিত হবে ভারতীয় সমাজের আমূল রূপান্তরসাধন ও সত্যিকার মানবিকীকরণে মৌলিক মানব সমাজ গড়ে তোলা।

এই প্রেক্ষাপটে, ২০০৫ খ্রীঃ এন বি সি এল সি (National Biblical Catechetical and Liturgical Centre) সেমিনারে আলোকপাত করা হয় যে, ঐশরাজ্যের উপস্থিতিকে যীশুর মূল্যবোধসমূহের প্রকাশক বিভিন্ন আন্দোলন, কাঠামো ও সমাজের মধ্যে স্বীকার করে নিতে হবে। আর এ ধরনের আন্দোলন ও দলের সঙ্গে মণ্ডলী নিজেকে সম্পৃক্ত করবে। পাঁচটি কেস স্টাডির মাধ্যমে জন ডি'মেলো দেখিয়েছেন যে, জগতের বিভিন্ন অংশে মণ্ডলী এইভাবে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত করেছে। ভারতীয় মণ্ডলী প্রকৃতপক্ষে কাদের পক্ষাবলম্বন করে ?

বিরুদ্ধে লড়ই করা, জাতি ও শ্রেণীভেদের কাঠামোগুলোর পরিবর্তন ঘটানো, এবং জনমত গঠনকারী ও গণমাধ্যমের সঙ্গে কাজ করা, ইত্যাদি। তারা আরও প্রস্তাব করেছেন যে, তপসিলী জাতি-উপজাতি এবং নারীর অধিকারকে সমর্থন যোগানোর লক্ষ্যে আমাদেরও সেই একই কাজ করা উচিত। বাস্তবিকপক্ষে, বিশপগণ বলেছেন, সব বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা করা উচিত। বিভিন্ন জন-সংগঠন, নিবেদিত এনজিওসমূহ ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ও যোগাযোগ স্থাপন আমাদের কার্যসাধন পদ্ধতির একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হতে হবে।

খ্রীষ্টভক্তগণ এমন কথা, যা তারা সঠিকভাবে বোঝেন না, প্রায়শ বলতে শোনেন, মানুষ এই ভূমিকা পালন করার জন্য আহূত, বলতে শোনেন, তারাই 'জগতের আলো', 'পৃথিবীর লবন', সমাজে 'খামি', 'জগতের বিবেক', ইত্যাদি। অনেক সময় তাদের বলা হয় তারা হচ্ছেন প্রবক্তা। তাদের বুঝতে হবে যে, এ ধরনের প্রকাশভঙ্গি প্রতিবার ব্যবহারের সময়, বিশপগণ সুস্পষ্ট ভাষায় সমাজে গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিকামী দলগুলোর উপস্থিতির কথা স্বীকারও করেন। (তারা এমনকি উল্লেখ করেছেন যে, এ দলগুলো মণ্ডলীর দলগুলোর চেয়েও 'অনেক বড়')। দেশে জরুরী অবস্থার পর পরই, তারা বুঝতে পেরেছিলেন পবিত্র আত্মার গতিময়তা মণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করছে যেন সে দেশে ন্যায্যতার জন্য ব্যাপক আন্দোলনে নিজেকে বিজড়িত করে। তারা এটাও উপলব্ধি করেন যে, মণ্ডলীর উচিত হবে ন্যায্যতার সমর্থন যোগানো আর তা তার প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে অনেক বলিষ্ঠভাবে করা, এবং এর থেকেও অধিক দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে সকল শুভবোধসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে নিজেকে বিজড়িত করার মাধ্যমে।

১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, বিশপগণ খ্রীষ্টভক্তদের আহ্বান জানিয়েছেন তেমনসব ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা করার, যারা/যেগুলো জাতীয় ঐক্যের জন্য এবং বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সংগ্রামে নিজেদের সঁপে দিয়েছে। বিশপগণ নিজেরাই বলেছেন, 'যে সকল ব্যক্তি এই হেতু সংগ্রাম করে যাচ্ছেন তাদের কণ্ঠের সঙ্গে আমরাও কণ্ঠ মিলাই। এদেশের আমাদের সকল ভাই ও বোনদের সঙ্গে গভীর একাত্মতায়, সমাজের

রূপান্তরসাধনের তাদের সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য নিজেদের আমরা উৎসর্গ করছি।' উন্নয়নকে বুঝা হয় প্রকৃত মানব অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামরত মানুষের সঙ্গে সামিল হওয়ার একটি কাজ হিসেবে। বিশপগণ এমনকি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ঐশ পরিকল্পনা দেশের জনগণের সংগ্রামে ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় সক্রিয়। এ সবই একটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রেরণা সঞ্চারী দর্শন।

বাক্স নং ১২/২

এটা চমৎকার বিষয় !

"এটা চমৎকার বিষয় !", একজনের অভিমত। "একটি মাত্র দলিলে, বিশপগণ খ্রীষ্টভক্তদের জাতীয় অখণ্ডতার রক্ষক, পুনর্মিলনের কর্মী, শান্তি-স্থাপক, তফসিলী জাতি ও উপজাতি এবং নারীর অধিকারের সমর্থক, এবং সামাজিক ন্যায্যতার জন্য সংগ্রামে উদ্বুদ্ধকারী হয়ে ওঠার পরামর্শ দিয়েছেন।" অন্য আর এক জায়গায় অন্যায্য জাত ও শ্রেণী কাঠামোগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ! এ সবই হতে হবে অন্যান্য ধর্মের মানুষ ও বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতায় !

"আমার কখনো কখনো মনে হয়েছে, মণ্ডলী সমাজে তার ভূমিকা নিয়ে খুব বেশী দম্ভোক্তি করছে, তার অর্জন নিয়ে খুব বেশী গর্বিত। কিন্তু এখানে, সে বাস্তবানুগভাবে ও বিনম্রচিত্তে স্বীকার করে যে, ন্যায্যতা ও মুক্তির জন্য অন্যান্য মানুষ ও সংগঠন 'অনেক ভাল কিছু' করছে। যা সত্যিই প্রশংসনীয় !"

২। ভিতর থেকে পরিবর্তনশীল সমাজ

বিশপগণ বারংবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, খ্রীষ্টভক্তগণকে অবশ্যই তাদের পেশাগত কাজের মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় নীতিমালা ও মূল্যবোধের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করতে এবং উত্তম সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে হবে। প্রত্যেককে তার পরিবার, তার স্কুল ও সমাজ এবং পৌর জীবনে হয়ে উঠতে হবে মঙ্গলসমাচারের খামি। অপর এক জায়গায় তারা নিজ বাড়িতে, সামাজিক দলে ও কর্মক্ষেত্রে সাক্ষ্যদান সম্পর্কে বলেছেন। খ্রীষ্টানরা, বিশেষ করে সাধারণ খ্রীষ্টভক্তগণ, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়/ক্ষেত্রসমূহে নিজেদের সম্পৃক্ত করবেন।

বিশপগণ সন্দেহাতীতভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও উন্নয়নের অবদানকে স্বীকার করে নিয়েছেন, তবে তারা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে অর্থনীতির উপর, আর এর থেকে বেশী, ন্যায্যতার জন্য সংগ্রাম, প্রশাসনিক কাজকর্ম, আইনী ক্ষেত্র, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনীতির উপর জোর দিয়েছেন। তারা বিশেষভাবে সাধারণ মঙ্গল প্রতিষ্ঠায় ও জনগণের অধিকার রক্ষায় আইনগত পেশা ও রাজনীতির উপর আলোকপাত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উল্লেখ করেছেন যে, রাজনীতি লোকদের ভাগ্য নির্ধারণ করে। একইভাবে, পোপ দ্বিতীয় জন পল ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে "রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-কলকারখানা, শিক্ষা. গণমাধ্যম, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পকলা ও ক্রীড়ার মত বিশাল ও জটিল" জগত সম্পর্কে বলেছেন (এশিয়ার মণ্ডলী, ৪৫), আর ২০05 খ্রী: এন বি সি এল সি সেমিনারে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, বাণিজ্য, গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি, ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয় (দ্র: খ্রীষ্টমণ্ডলী, ৩১, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা; খ্রীষ্টাদর্শ-প্রচার ৭১)।

এ সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে খ্রীষ্টানদের অপরিহার্য অবদানের উপর গুরুত্বারোপ ক'রে, বিশপগণ অবশ্যই সঠিক কাজটি করেছেন। আসলে, এটা শুধুমাত্র খ্রীষ্টানদের বিষয় নয় কিন্তু সকল মানুষের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৩। জনগণকে আত্মসচেতন ও সংগঠিত করা

"দেশের আশু চাহিদার প্রতি মণ্ডলীর সাড়াদান" শীর্ষক ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সি বি সি আই-এর বিবৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে, স্টান লুর্দুস্বামী লিখেছেন : কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হলেও...., সি বি সি আই-এর সুপারিশগুলো অপ্রতুল, কেননা এগুলো পরিবর্তনকে মূলত: রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দলগুলোর গৃহীত উদ্যোগের ফসল হিসেবে বিবেচনা করে, আর আত্মসচেতনমূলক কার্যক্রমের প্রতি এবং, এর থেকেও অধিক, তাদের অধিকারের জন্য জন-সংগঠনগুলোর প্রতি সঠিক মনোযোগদানে ব্যর্থ হয়। তার এই সমালোচনাটি এদেশে মণ্ডলীর সার্বিক সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রে

অনেকাংশে যুক্তিসম্মত। তবে, বিশপগণ এমন অনেক মন্তব্য করেছেন যেগুলো লোকদের আত্মসচেতনকরণ ও সংগঠিতকরণ করে তোলার, আর একই ভাবে তাদের সংগ্রামে সামিল হওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেয়।

বাস্তবিকপক্ষে বিশপগণ প্রায়শ সচেতনতা সৃষ্টি ও লোকদের আত্মসচেতন করে তোলার প্রয়োজনীয়তা দাবি করেছেন। এদেশে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দলগুলোর এবং আন্তর্জাতিক কায়েমী স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতার অভাবই হচ্ছে দরিদ্রতা ও বৈষম্যের স্থায়িত্বের একটি প্রধান কারণ, আর উন্নয়নকে দেখা উচিত লোকদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার একটি কাজ হিসেবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বের অন্তর্গত হচ্ছে 'অনুন্নয়ন ও অবিচারের লক্ষণীয় ফলাফলগুলো নিয়ে আলোচনা করা এবং ব্যাপক পরিচিত করে তোলা। এ দেশে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম সর্ব শ্রেণীর মানুষের জন্য পরিচালিত হওয়া দরকার। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি শিক্ষার অন্যতম প্রধান কাজ, যার লক্ষ্য হবে সামাজিক দিক দিয়ে তথ্যাভিজ্ঞ এবং নিবেদনপ্রাণ পরিচালকদের গঠন করা।

অধিকন্তু, জনগণের সার্বিক জীবনাবস্থা, গর্ভপাতের এবং দারিদ্র্য ও ক্ষুধার সমস্যা, সংখ্যালঘু অধিকার, তফসিলীভুক্ত খ্রীষ্টানদের অধিকার, শিশু শ্রম, ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতার বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। অন্যায্যতার কাঠামোগুলো সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে হবে। এইভাবে, ন্যায্যতা, শান্তি ও উন্নয়ন (JPD) বিষয়ক কমিশন কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। সামাজিক অবিচারের প্রকৃতি ও মূলগুলো এবং প্রতি-মূল্যবোধগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যার শিক্ষা লাভ করতে হবে। মণ্ডলীতে ও জগতে তাদের প্রেরণদায়িত্ব সম্পর্কে ভক্তসাধারণকে অবশ্যই সুবেদী ও বিবেকী হতে হবে আর রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন (এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ) ভক্তসাধারণের আহ্বানের একটি অপরিহার্য দিক। সামাজিক অন্যায্যতার, বিশেষ করে তফসিলী জাতি ও নারীর সমস্যাদির প্রতি খ্রীষ্টভক্তগণকে অবশ্যই উত্তরোত্তর সংবেদনশীল হয়ে উঠতে হবে।

কাজেই, ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ সুপারিশ করেছেন, দরিদ্র, দলিত ও আদিবাসীদের আত্মসচেতন, প্রশিক্ষিত, সংগঠিত ও ক্ষমতাপন্ন করে তোলার লক্ষ্যে, সকল ধর্মপ্রদেশে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আমাদের সামাজিক প্রৈরিতিক সেবাকাজে শীর্ষ অগ্রাধিকার প্রদান

করতে হবে। আসলে, এই আত্মসচেতন ও সংগঠিতকরণ কার্যক্রম সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পরিচালিত হবে। এই প্রেক্ষিতে, বিশপগণ সামাজিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেবেন।

বিশপগণ সর্বোপরি আলোকপাত করবেন, অনেক সময় সরাসরি না হলেও, লোকদের সংগঠিতকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর। উদাহরণস্বরূপ, তারা ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করেছেন, দরিদ্রতার মূল কারণগুলির নির্মূলীকরণে মণ্ডলী দেশের প্রচলিত আন্দোলনের সঙ্গে অনেক বেশী সম্পৃক্ত। তারা আরও প্রকাশ করেন যে, মানব মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের জন্য খ্রীষ্ট আজকে আমাদের সঙ্গে আমাদের সহ-ভাইদের দাবির মধ্য দিয়ে কথা বলছেন। তারা এমনকি এ-ও বলেছেন, মুক্তির জন্য দেশীয় জনগণের সংগ্রামে ও মনোবাসনায় ঐশ পরিকল্পনা সক্রিয় রয়েছে। আর ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বলেন যে, পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করছেন যেন সে দেশে ন্যায্যতার জন্য ব্যাপক আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করে।

১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অনৈক্যের শক্তিগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার পর, বিশপগণ সামাজিক কর্মীদের আত্মনিবেদন এবং তাদের সংগঠনকে দেখেছেন 'একটি আশার চিহ্ন' হিসেবে। অনেক ব্যক্তি ও সংগঠন জাতীয় ঐক্যের জন্য এবং বৈষম্য দূরীকরণের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেন।' সেই একই বিবৃতিতে, তারা দুর্বল শ্রেণীর অনুকূলে পরিস্থিতির পরিবর্তনে কর্মরত সকল সংগঠনগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন। এইমাত্র আমরা যেমনটি জানলাম, ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা এমনকি গুরুত্বারোপ করে বলেছেন যে, দরিদ্র, দলিত আদিবাসীদের সংগঠিত করাই হবে আমাদের প্রৈরিতিক সেবাকাজের শীর্ষ অগ্রাধিকার। এক্ষেত্রে অসংগঠিত শ্রমিকদেরও সংগঠিত করা দরকার।

৪। গণ-সংগ্রাম ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ

কাঠামোগত রূপান্তরসাধনের প্রক্রিয়া বিষয়ক বিশপগণের সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত অংশটি তাদের ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের বিবৃতিতে পাওয়া যায় : উন্নয়ন ও মুক্তির কাজে, মণ্ডলীর "উচিত যথাযথভাবে ভেবেচিন্তে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, রাষ্ট্রীয় অথবা আন্তর্জাতিক উদ্যোগে, অথবা

বাক্স নং ১২/৩

গণ-আন্দোলনসমূহের আবশ্যিকতা

"তার উপর অর্পিত মঙ্গলসমাচারের গুণেই মণ্ডলী মানুষের অধিকারসমূহ ঘোষণা করে। বিশ্বের সর্বত্র এসব অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বর্তমানে যে গতিশীল প্রক্রিয়ায় কাজ চলছে তা মণ্ডলী স্বীকার করে এবং তার প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল" (বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী, ৪১-৪২, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা)। মণ্ডলী "জনগণের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় উৎসাহ যোগাবে এবং এগুলোর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করবে, যেন তারা তাদের অধিকারের প্রতিবিধান ও সংহতকরণে এবং প্রকৃত ন্যায্যতার সন্ধানে তাদের নিজস্ব তৃণমূল পর্যায়ের নানা সংগঠন গড়ে তুলতে ও এগুলোর উন্নয়নসাধন করতে পারে" (মেডেলিন, দরিদ্রদের মণ্ডলী, ২৭)। "তাদের নিজস্ব অধিকারের জন্য লোকদের নিজেদের পক্ষ থেকে সংগ্রাম মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় পর্যায়ের সংসদগুলোকে তাদের নিজ নিজ সমাজগুলিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো চিহ্নিতকরণ, দলিলবদ্ধকরণে এবং এগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে। এগুলো এবং এগুলোর জাতীয় মণ্ডলীগুলো জনগণ, দল ও ব্যক্তিবর্গের নিজেদের বিধিসম্মত অধিকারের জন্য সংগ্রামকে সমর্থন যোগানোর উপায়সমূহ খুঁজে বের করবে, সংহতির নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কাজে তাদের সাহায্য করবে, যেন তারা সংগ্রামে একে-অপরকে বলীয়ান করে তুলতে পারে" (মণ্ডলীসমূহের বিশ্ব পরিষদ; নাইরোবী সম্মেলন, ১৯৭৪)।

" শ্রমিকদের মধ্যে সংহতির এবং শ্রমিকদের সঙ্গে সংহিতর সর্বদা নতুন নতুন আন্দোলনের প্রয়োজন। যখনই কর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের সামাজিক মর্যাদাহানি, শ্রমিকদের শোষণ-নিপীড়ন, দরিদ্রতা ও ক্ষুধার ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্রসমূহ সংহতির দাবি জানায় তখনই এ সংহতির সব সময় উপস্থিতি থাকতে হবে। এই হেতুর প্রতি মণ্ডলী দৃঢ় নিয়োজিত, কেননা এটাকে সে তার প্রেরণদায়িত্ব, তার সেবাকাজ, খ্রীষ্টের প্রতি তার আনুগত্যের একটি প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করে, যেন সে সত্যিই 'দরিদ্রদের মণ্ডলী' হয়ে উঠতে পারে" (Laborem Exercens, 8)।

অন্যান্য খ্রীষ্টীয় বা এমনকি অখ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সৃষ্ট প্রকল্পসমূহে সহযোগিতা করা" (মণ্ডলীর প্রেরণকার্য, ১২, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা)। সামাজিক সম্পৃক্ততায় নিয়োজিত খ্রীষ্টীয় দলগুলো সে সকল সংস্থা ও আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের বিজড়িত করবে, যেগুলোর লক্ষ্য সমাজের দুর্বল শ্রেণীগুলোকে সাহায্য করা, যেন এগুলো চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজেদের ন্যায়সঙ্গত স্থানটি পেতে পারে।

এপরপর বিশপগন কথা বলেছেন বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে : মানুষের প্রায়শ মুখোমুখি হওয়া বাধা-বিপত্তিগুলোর প্রতিবিধানে জনমত সৃষ্টির বিষয়টি অপরিহার্য বলে মনে হয়। এই জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রেস এবং অন্যান্য গণমাধ্যম বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। একে কখনো কখনো সমর্থন যোগাতে হবে এর পক্ষে প্রচারণা ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে এবং মাঝে-মধ্যে এমনকি আইনের শরণাপন্ন হওয়ার মাধ্যমে। গবেষণা ও আলোকপাতেরও প্রয়োজন রয়েছে, যেন প্রতিরোধের পদ্ধতিসমূহ এবং সামাজিক পরিবর্তনের কৌশলসমূহ সংক্রান্ত যথাযথ পরিচালনা যোগানো সম্ভব হয়, আর এসবই হতে হবে মঙ্গলসমাচারের চেতনা ও দেশীয় ঐতিহ্যের আলোকে।

বিশপগণের কথার মধ্যে রয়েছে দ্বিধার কিছু লক্ষণ (উদাহরণস্বরূপ, এ ধরনের কথা : যথাযথভাবে ভেবেচিন্তে, কখনো কখনো, মাঝে-মধ্যে এমনকি)। বিভিন্ন গণ-আন্দোলন এবং চাপ বা প্রভাব সৃষ্টিকারী দলের প্রয়োজনীয়তার কথা অনেক জোরালোভাবে উচ্চারিত হতে হবে, সেই সাথে গণ-আন্দোলনে মণ্ডলীর আত্মনিবেদনের কথাও (দ্র: বক্স নং ১২/৩)। তবে বিশপগণের বিবৃতিগুলোর গুরুত্ব রয়ে যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ তফসিলীভুক্ত খ্রীষ্টানদের ন্যায্যতার আন্দোলনকে এবং এ আন্দোলনের পত্র, স্মারক, অবস্থান কর্মসূচী, র‍্যালি ও বিক্ষোভের ব্যবহারকে সমর্থন করেছেন। এরপর তারা এ-ও প্রস্তাব করেছেন যে, মণ্ডলীর উচিত একটি আন্দোলন শুরু করা, যার লক্ষ্য হবে দুর্নীতির করালগ্রাস থেকে সমাজকে মুক্ত করা; প্রস্তাব করেছেন যে, এই সংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবেন বিশপ, পুরোহিত, ধর্মব্রতী ও মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠানগুলো। আসলে, মণ্ডলীর পক্ষে উচিত হবে অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও এ ধরনের আন্দোলন ও কৌশলেরও সুপারিশ করা।

রাজনীতিবিদদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষায় জনগণকে নিয়োজন করার জন্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে প্রায়শ ব্যবহার করা হলেও, ধর্মগুলোর বরং উচিত সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য লোকদের অনুপ্রাণিত করা। ভক্তসাধারণ অবশ্যই সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করবেন। জনমতের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। বিশপগণ প্রবক্তা হয়ে ওঠার এবং বিভিন্ন ধরনের অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা বলেছেন : আমরা বিভিন্ন ধরনের অবিচার ও বৈষম্যের প্রতি সোচ্চার হওয়ার মাধ্যমে শান্তি-স্থাপক হয়ে উঠব।

বেশ কয়েক জায়গায়, বিশপগণ সমর্থনের সুরে জনগণের সংগ্রাম সম্পর্কে বলেছেন। বাস্তবে, ঐশ পরিকল্পনা জনগণের সংগ্রামে ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় সক্রিয়। কাজেই মণ্ডলীকে অবশ্যই দরিদ্রতার বিরুদ্ধে এবং খাঁটি মানব অস্তিত্বের জন্য জনগণের সংগ্রামে শরিক হতে হবে; আর এ সকল সংগ্রামে যারা জড়িত তাদের অবশ্যই সে সমর্থন যোগাবে। সে সংগ্রাম করবে অনগ্রসর ও নিপীড়িতদের উত্তোলনের জন্য, বিশেষ করে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের মাঝে, এবং তফসিলীভুক্ত খ্রীষ্টানদের জন্য। সে খ্রীষ্টভক্তদের অনুপ্রাণিত করবে ন্যায্যতার জন্য সংগ্রামে সামিল হওয়ার তাদের ভীতিকে জয় করার জন্য। বিশপগণ জাতীয় ঐক্যের জন্য এবং বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সংগ্রামে নিবেদিত ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনগুলোকে প্রশংসা ও সমর্থন করেছেন।

মণ্ডলী প্রকৃতপক্ষে ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জড়িত। সমাজ পরিবর্তনে সকল শুভবোধসম্পন্ন মানুষের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য মণ্ডলী অঙ্গীকারবদ্ধ। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ ভক্তসাধারণের পক্ষ থেকে একটি সুন্দর জগত প্রতিষ্ঠায় মণ্ডলীর পরিধির বাইরে তাদের কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন। তারা এমনকি এ বাসনার কথাও ব্যক্ত করেছেন যে, ভক্তসাধারণ জাগতিক প্রকল্পসমূহে নেতৃত্বদানের ভূমিকা বুঝে নেবে।

তবে সার্বিকভাবে, এ ধরনের মূলভাবকে বিশপগণ

বাক্স নং ১২/৪

দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবিতা

কয়েকজন এশীয় বিশপ ঘোষণা করেছেন : যেখানে প্রতিযোগিতাপূর্ণ স্বার্থ, দ্বন্দ্ব সেখানে নৈমিত্তিক বিষয়। সামাজিক আন্দোলন কাজ প্রায়ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। এখানে দু'টি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন : দ্বন্দ্ব মানে অবশ্যসম্ভাবীভাবে সহিংসতা নয়, কিংবা এটা অবশ্যসম্ভাবীভাবে খ্রীষ্টীয় প্রেমের বিরোধীও নয়। দ্বিতীয়তঃ, দ্বন্দ্ব অনেক সময় ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে সত্যিকার সংলাপ অর্জনের একটি আবশ্যক মাধ্যম।... আমরা জানি যে, সামাজিক ন্যায্যতার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টভক্তদের প্রস্তাবিত অনেক কর্মসূচী দ্বন্দ্বের দিকে চালিত হয়। কিন্তু তারপরও, দ্বন্দ্ব বিকাশেরও একটি চিহ্ন। অন্যদের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন যেন দুঃখভোগীদের কল্যাণে অবস্থান গ্রহণে আমাদের বাধা না দেয়।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নাইরোবীর মণ্ডলীসমূহের বিশ্ব পরিষদে স্পষ্ট বলা হয়েছে : নিপীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক্ষমতার মুখোমুখি হওয়া এবং ক্ষমতা হস্তান্তর অপরিহার্য করে তোলে। বিগত বছরগুলিতে, মণ্ডলীগুলো এ সকল বিষয়ের দিকসমূহকে অবমূল্যায়ন করেছে, এমনকি যখন এগুলো এ সকল দিককে অনেক কম হারে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রয়োজন বিভিন্ন কর্মসূচী বা আন্দোলন, যেগুলো জনগণের ক্ষমতা প্রকাশ করবে। আমাদের মণ্ডলীগুলোর আশু প্রয়োজন চলমান মানব সংগ্রামে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হওয়া। ঐশরাজ্যের মঙ্গলসমাচার এই জগতের বিভিন্ন সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

শান্তি, মুক্তি ও ন্যায্যতার পথ অনেক সময় দ্বন্দ্ব অপরিহার্য করে তোলে। সকল সিদ্ধান্তের দাবি ত্যাগস্বীকার, সকল পরিবর্তনের দাবি সংগ্রাম। মঙ্গলসমাচারের মত এটাই তো হল ইতিহাসের শিক্ষা, বার্তা। তাঁর পার্থিব জীবনকালে যীশু সব সময় তার সময়ের লোকদের পক্ষ নিয়েছেন। কাজেই, খ্রীষ্টের আশ্রয়ে জনগণের সঙ্গে বসবাসের অর্থ, যারা নির্যাতনের শিকার তাদের পক্ষ নেওয়া।

খাটো করে দেখেছেন, যেমন জনগণকে আত্মসচেতনকরণ ও সংগঠিতকরণ, 'প্রাবক্তিক বাণী উচ্চারণ' ও সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা, দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবিতা, এবং প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের পদ্ধতিসমূহ। ক্ষুধা ও ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান বা কার্যক্রমের কথা বাদ দিলে, বিশপগণ কখনো কতিপয় কারণে কার্যক্রম পরিচালনার কথা বলেননি। এর আগে আমরা যেমনটি দেখেছি (অধ্যায় ৩, পৃষ্ঠা ২৮), মণ্ডলীর উচিত কিছু কিছু বিষয় অনেক সরাসরি ও বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরা, যেমন ভূমি সংস্কার, কর্মসংস্থান, পণপ্রথা, ইত্যাদি। তার আরও কাজ হবে কালা কানুনের বিপরীতে কিছু আইন প্রণয়নকে কিংবা কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের ন্যায় কার্যক্রমকে সমর্থন যোগানো। আসলে বিশপগণ ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বীকার করেছেন যে, একটি ন্যায় সমাজ প্রতিষ্ঠায় মণ্ডলী অনেক কিছুই করতে পারে, আর তা করতে পারে শুধুমাত্র তার নিজ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কাজ না করে গিয়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে শুভবোধসম্পন্ন সকল মানুষের সঙ্গে নিজেকে বিজড়িত ক'রে।

সংগ্রাম সম্পর্কে বলাটা নিঃসন্দেহে এটা নির্দেশ করে যে, সামাজিক রূপান্তরসাধনে সম্পৃক্ত হওয়ার সঙ্গে যুক্ত দ্বন্দ্ব। বিষয়টা এ ধারণার সঙ্গে খাপ খায় যে, যীশুর শিষ্যগণ, তাঁর অনুসরণে, এমন একটি সমাজ গঠন করেছিলেন, যা ছিল একইসঙ্গে জগতের সঙ্গে সংহতিতে ও দ্বন্দ্বে। তাই বিশপগণ ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে এ কথাগুলি বলেছেন : 'খ্রীষ্ট যিনি মন্দ-শক্তির মুখোমুখি হয়েছেন, তাঁর অনুসরণ ক'রে, আমরা মঙ্গলসমাচারের কারণে কষ্টভোগকে আমাদের জীবনে বরণ করে নিই। যীশুর প্রেরণদায়িত্ব তার ক্রুশ থেকে অবিচ্ছেদ্য', আর কষ্টভোগ প্রতিটি খ্রীষ্টানের শিষ্যত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা হল যারা পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করে তারাসহ সকল মানুষের অবস্থা। আসলে অনেক ব্যক্তি ও সংগঠন, যাদের অধিকাংশ অন্যান্য ধর্মের, কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত, যেন তারা মানব মর্যাদা অস্বীকার করা হয়েছে এমন মানুষের মধ্যে নতুন জীবনের আশা সঞ্চারিত করতে পারেন। খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার কিছু কিছু অংশে দ্বন্দ্বের ধারণাটি ভারতীয় কাথলিক বিশপগণের চেয়ে অনেক সরাসরি ও বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে (দ্র: বাক্স নং ১২/৪)।

৫। কাজেই কি করা উচিত ?

১১ অধ্যায়ে কতগুলো প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলোর নেপথ্য উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় অংশ-গ্রহণধর্মী কাঠামোসমূহ গড়ে তোলা ও শক্তিশালী করা, যেন সামাজিক ন্যায্যতা ও সামাজিক রূপান্তরসাধনকে মণ্ডলীর সেবাকাজের একটি অপরিহার্য, একান্ত প্রয়োজনীয়, এমনকি সুবিধাজনক ও অগ্রাধিকারপূর্ণ দিক হিসেবে পরিণত করা যায় : তৃণমূল পর্যায়ে শত শত SCCs ও SHCs-কে সংগঠিত করা, আশেপাশের এলাকায় ও মণ্ডলীতে বাস্তব বিষয়সমূহের মোকাবেলা করা, বিস্তৃত বিষয়সমূহের সঙ্গে ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত হওয়া, একে-অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করা আর এমনকি একটি জোট গঠন করা, এবং অন্যান্য ধর্মে ও মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও দলের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলা; বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর দল ও কমিটি সংগঠিত করা; এছাড়া ধর্মপ্রদেশীয় পর্যায়ে উপযুক্ত কাঠামোসমূহ গড়ে তোলা। এ বিষয়টা গোটা মণ্ডলীকে তার সামাজিক প্রেরণদায়িত্বে উত্তরোত্তর অনেক বেশী সচেতন, নিবেদিতপ্রাণ এবং সম্পৃক্ত করে তুলবে।

আরও কি করা উচিত ? দু'টি মৌলিক কার্যক্রম সম্ভব। প্রথম কার্যক্রমটি হচ্ছে, মণ্ডলীভিত্তিক দল বা আন্দোলনসমূহ গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ, যেমন SCCs, SHCs, 'নিজেরা করি' দল (SHGs), অথবা বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর দল, এইমাত্র আমরা যেমনটি জানলাম। এ দলগুলো অবশ্যই অন্যান্য পটভূমির মানুষজন ও সংগঠনের প্রতি সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবে, আর এ দলগুলো পারবে মাঝে-মধ্যে এ পটভূমির কয়েকজন সভ্যকে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে। এই ব্যবস্থার মধ্যে, কিছু খ্রীষ্টীয় ব্যক্তিবর্গ ও দল অন্যান্য ধর্মের মানুষ ও জাগতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলবে; আর এ সকল ব্যক্তি ও দল মণ্ডলী তথা খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্যান্য ধর্মের মানুষ ও জাগতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম করে তুলবে।

এই কার্যক্রমটি খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসে গঠনদানকে সহায়তা করা, মঙ্গলসমাচারের প্রতি তাদের বিশেষ আত্মনিবেদনকে উৎসাহিত ও বর্ধনা করা, এমনকি স্থানীয় সমস্যা ও চাহিদাগুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে চমৎকার। কেননা এ ধরনের দলগুলো অনেকবেশী সমপ্রকৃতির। তবে, কিছু মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে, যেমন এ ধরনের দলগুলো প্রার্থনা, আলোকপাত, সংলাপ, বিশ্বাসে গঠনদানের উপর আলোকপাত অব্যাহত রাখতে পারে, কর্মপ্রচেষ্টায় গভীরভাবে সম্পৃক্ত হওয়াকে উপেক্ষা করতে পারে, বিশেষ করে বিস্তৃত পর্যায়ে এবং বিতর্কিত বিষয়সমূহে। এ সকল দলকে সর্বোপরি শাসন করতে পারে যাজক বা ধর্মব্রতীরা, বিশেষ করে যদি এমন হয় যে, দলগুলো গভীরভাবে সামাজিক দিক দিয়ে তেমন সতেচন ও নিবেদিত নয়। জাগতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে এগুলোর সম্বন্ধ স্থাপন ভাসা-ভাসা পর্যায়ে থেকে যেতে পারে আর এগুলোর সম্পৃক্ততা কম কার্যকর, কেননা খ্রীষ্টানরা একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু দল মাত্র।

অধিকতর কার্যকর কার্যক্রম সম্ভবত হচ্ছে, প্রাসঙ্গিক 'জাগতিক' দল ও আন্দোলনসমূহে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের অংশগ্রহণের উপর আলোকপাত। কার্যকর পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজন একটি ব্যাপক-ভিত্তিক অংশগ্রহণ অথবা কমপক্ষে সমর্থন, আর এটা দাবি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের এবং বৃহত্তর সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণ। একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু দল হওয়ার দরুণ, খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা অবশ্যই খামি'র ন্যায় কাজ করবে এবং জাগতিক কর্মমুখী দল ও আন্দোলনসমূহ গঠন ও ক্রমবিকাশে অবদান রাখবে। তাদেরকে অবশ্যই তাদের কর্মকাণ্ডে, কার্যক্রমে ও সংগ্রামে জান-প্রাণ দিয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই লক্ষ্যে তাদের নিজস্ব খ্রীষ্টীয় সহায়ক বা অনুপ্রেরণাধর্মী দলগুলো তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে ও প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, যদিও কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টবিশ্বাসী গণ-আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু তাদের সম্পৃক্ততা তাদের ধর্মবিশ্বাস দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত নয়। তারা এমনকি অন্যান্য খ্রীষ্টবিশ্বাসী ও মাণ্ডলিক পরিচালকদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ভাবতে পারে, আর তারা সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য মণ্ডলীকে খুবই কমই উৎসাহিত করে। এই পরিস্থিতির আমূল উত্তরণ ঘটানো প্রয়োজন আর এ ধরনের খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের ও দলগুলোকে মণ্ডলীতে একটি প্রেরণাসঞ্চারী ও অনুঘটনধর্মী ভূমিকা পালনে উৎসাহ যোগাতে হবে।

বাক্স নং ১২/৫

মণ্ডলীর অমিত সম্ভাবনা-শক্তি

এক বন্ধু এমন কথা বলতে পছন্দ করেন যে, মণ্ডলী একটি "সুবৃহৎ এনজিও অথবা এমনকি আন্দোলন" হয়ে উঠতে পারে। জগতের অনেক অংশে এ মণ্ডলীর 'সংগঠিত' কাঠামোসমূহ (স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে), তার অনুপ্রেরণাধর্মী ও উদ্দীপনামূলক ক্ষমতা এবং তার বিপুল সভ্য-সভ্যা এগুলো সবই তাকে অমিত সম্ভাবনা-শক্তি যোগায়, তবে শুধুমাত্র ত্রাণ ও উন্নয়ন কাজের জন্য নয়, পাশাপাশি সামাজিক কাজেরও জন্য। কিন্তু এই সম্ভাবনা-শক্তি এখনো পর্যন্ত অব্যবহৃত ও সুপ্ত। কখন মণ্ডলী সামাজিক দিক দিয়ে জাগ্রত হবে, কখন গুটিকয়েক প্রাবক্তিক প্রত্যাখ্যান ছেড়ে সুসমন্বিত কার্যক্রম ও বাস্তব আত্মনিবেদনের দিকে সে অগ্রসর হবে ?

এ দু'টি কার্যক্রম পরস্পবিরোধী কিংবা একচেটিয়া কোনটিই নয়। এগুলো একে-অপরকে সমর্থন যোগাবে ও পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী যে-কোন একটি কার্যক্রম পছন্দ করতে পারেন। স্থানীয় পরিস্থিতি ভেদে – যেমন দেশে, ধর্মপ্রদেশে বা ধর্মপল্লীতে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সংখ্যা, তাদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা পটভূমি, তাদের বিশ্বাস ও গঠনের গভীরতা, ইত্যাদি – মণ্ডলীও যে-কোন একটি কার্যক্রমের উপর জোর দিতে পারে। আরও ভাল হয় যদি SCCs, SHCs, SHGS এবং অন্যান্য (খ্রীষ্টান বা অখ্রীষ্টান) দল বা আন্দোলনের সদস্য-সদস্যাদের উপর অপরাপর আন্দোলন, সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা বা না করার বিষয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়ভার ছেড়ে দেওয়া হয়। এ বিষয়টি তাদের দলগুলোর একত্ব ও বহুত্ববাদকে উৎসাহ যোগাতে পারে।

খ্রীষ্টীয় সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসে গঠনদান সামাজিক বিশ্লেষণ, খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা, একটি প্রাসঙ্গিক সামাজিক আধ্যাত্মিকতা, আত্মসচেতন, অবস্থান গ্রহণ ও প্রবক্তা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নাগরিক-সংগঠন ও আন্দোলনগুলোর ভূমিকা ও আবশ্যিকতা, টানাপোড়েন ও

বাক্স নং ১২/৬

কাজ ও প্রগাঢ় ধর্মাচারের প্রয়োজনীয়তা

'সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান' খ্রীষ্টীয় জীবনে একটি কেন্দ্রিয় ভূমিকা পালন করে। বাস্তবমুখী আচরণ, কাজ, কর্ম এবং রীতিনীতি –এ সবই খুব গুরুত্বপূর্ণ, যদিও কাজের জন্য চিন্তা আবশ্যক। দুর্ভাগ্য বলতে হয়, বলছেন Schillebeeckx, যুগ যুগ ধরে মণ্ডলী ব্যস্ত থেকেছে সত্য প্রণয়নে, যখন সে জগতের ভালোর জন্য বলতে গেলে প্রায় কিছু করেনি। অন্য কথায়, মণ্ডলী আলোকপাত করেছে ধর্মমতের উপর আর প্রগাঢ় ধর্মাচারকে ছেড়ে দিয়েছে যারা সদস্য নয় এবং যারা অ-বিশ্বাসী তাদেরই হাতে। (তবে আমার এক বন্ধু এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন : মণ্ডলী সব সময় যীশুর শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করার এবং সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদানের উপর জোর দিয়ে এসেছে। একমাত্র সমস্যাটি হল, সে অনেক সময় যা শিক্ষা দিয়েছে তা নিজে পালনে ব্যর্থ হয়েছে।) তবে ধর্মমতের উপর প্রগাঢ় ধর্মাচারের প্রাধান্য থাকতে হবে।

বিগত দশকগুলোতে, কিছু মণ্ডলীর পরিচালক 'ধর্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তির' উপর জোর দিয়ে এসেছেন। কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা (STC) কবে ধর্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে ? ধর্মতত্ত্ব ও নীতিমালা নিয়ে মণ্ডলী যতটা আগ্রহী বা চিন্তিত, মঙ্গলসমাচারের অনুশীলন নিয়ে সে ততটা আগ্রহী বা চিন্তিত কবে হবে ? আমাদের ধর্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তির প্রয়োজন রয়েছে, কেননা এটা যথাযথভাবে আমাদের সামাজিক অঙ্গীকারের প্রকাশ ঘটায়। (যদি অনেক ব্যক্তি ও দল এ ধরনের ধর্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তির বিকাশ ঘটায়, তাহলে তা আলোকপ্রদ ও চ্যালেঞ্জিং হবে ! আপনার জন্য এবং আপনার পরিবার বা সমাজের জন্য কী আলোকপ্রদ ও চ্যালেঞ্জিং হবে ?) তদুপরি অপরিহার্য হল, যেন আমরা সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের ও মানুষের জন্য কেন্দ্রিয় ভূমিকা এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও রীতির সন্ধান করি।

দ্বন্দ্বের অপরিহার্যতা, ইত্যাদিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে। খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ স্থানীয় বিষয়সমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে, এ সম্পৃক্ততা তাদেরকে গড়ে তুলবে আর তারা যোগাযোগ গড়ে তুলতে এবং নাগরিক সংগ্রামে ও বৃহত্তর কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে শিখবে। তারা বিক্ষোভ ও র‍্যালি, অবস্থান কর্মসূচী ও প্রতিবাদসহ গণ-কার্যক্রমগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। তারা উত্তরোত্তর জাগতিক সংগঠন ও সংগ্রামে যোগ দেবে।

একমাত্র এই উপায়েই মণ্ডলী বিশপগণের বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপদান দিতে ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে এবং ন্যায্যতা ও মুক্তির জন্য ব্যাপক আন্দোলনে সামিল হতে পারবে। একমাত্র এই উপায়েই মণ্ডলী প্রাবক্তিক যত প্রত্যাখ্যানকে সত্যিকারঅর্থে ছাড়িয়ে যেতে, মুক্তি ও সামাজিক অংশগ্রহণের জন্য সংগ্রামে বাস্তবসম্মতভাবে ও সক্রিয়তার সাথে সম্পৃক্ত হতে, এবং তার শুভ সংবাদের প্রেরণদায়িত্বকে আরও পরিপূর্ণভাবে জীবনে প্রয়োগ করতে ও তার অমিত সামাজিক সম্ভাবনা-শক্তিকে বাস্তব রূপদান করতে পারবে (দ্র: বক্স নং ১২/৫)।

দু'টি মৌলিক কার্যক্রম প্রসঙ্গে, এই পর্বটি ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নাইরোবীর মণ্ডলীসমূহের বিশ্ব পরিষদের এ কথাগুলি দিয়ে শেষ করা যেতে পারে : মুক্তি ও উন্নয়নের জন্য এ সকল সংগ্রামে মণ্ডলীর অংশগ্রহণ স্থানীয় পরিস্থিতি ভেদে প্রকৃতিতে ভিন্ন হবে। কিছু কিছু ঘটনায়, মণ্ডলীগুলোর ভূমিকা হবে নেতৃত্বদানের ভূমিকা। অন্যান্য ঘটনায়, দাবি করা হতে পারে সহযোগিতায় জাগতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে হাত মেলানো। অধিকন্তু, আরও অনেক পরিস্থিতিতে, পালনের জন্য মণ্ডলীগুলোর সংগ্রামের নয় কিন্তু সেবার ভূমিকাও থাকতে পারে। তবে এগুলো যেন কোন মতেই সামাজিক দিক দিয়ে অসম্পৃক্ত 'অন্য পার্থিব জীবন ও ভোগবিলাসিতার' আরামে গা ভাসিয়ে না দেয়।

উপসংহার

২০০৫ খ্রী: এন বি সি এল সি সেমিনার অনুযায়ী, 'ভারতীয় মণ্ডলী এত বেশী ধর্মকর্মময়, বিধিনির্ভর আর ধর্মতাত্ত্বিক যে এটা জগতের বাস্তবতাসমূহে নিজেকে পুরোপুরি নিমজ্জিত করতে পারে না। যে কারণে সে ঐশরাজ্যের মূল্যবোধগুলোর বাস্তবায়নে অনেক ব্যক্তি ও আন্দোলনের সঙ্গে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে সক্ষম হয়নি। তবে, খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণের কিছু অংশ এ ধরনের সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে অনেক সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করছে...। মণ্ডলী তার চিন্তা ও ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা বা অনুশীলন কাজে অনেক বেশী কর্মশীলতার পরিচয় দিয়েছে। তবে, তৃণমূল পর্যায়ে দলিলগুলো বাস্তবায়নে কতটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ।' তাই অংশগ্রহণকারীগণ এই বলে শেষ করেছেন : মণ্ডলীর ভিতর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রে সক্রিয় অনেক দল রয়েছে যেগুলো, যে ঐশরাজ্যের স্বপ্ন যীশু দেখেছেন, তার কারণের প্রতি একটি নবায়িত আত্ম-নিবেদনের জন্য আমাদের তাড়না যোগাচ্ছে। আমরা ভারতীয় কাথলিক মণ্ডলীকে আহ্বান জানাই যে সকল আন্দোলন মুক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে অধিকতর সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য, যে সকল দল এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য।

বিশপগণ যেমনটি জোর দিয়ে প্রকাশ করেছেন, মণ্ডলী কি সত্যিই প্রস্তুত আর রাজি আজকের সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হওয়ার জন্য, খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত ও রূপান্তরিত হওয়ার জন্য, চোখের জল ফেলার জন্য, ঝুঁকি নেওয়ার জন্য, গভীরে ঝাপ দেওয়ার জন্য, এবং শুভ সংবাদ ঘোষণা ও তার সামাজিক প্রেরণদায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য ? মণ্ডলী কি তার সভ্যদের বেশী বেশী উৎসাহ যোগাবে সামাজিক বিষয়সমূহের সঙ্গে এবং বিস্তৃত সংগঠনগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য ? জনগণের মণ্ডলী, বিশেষ করে দরিদ্রদের মণ্ডলী হয়ে ওঠার লক্ষ্যে মণ্ডলীর জন্য এটা কী শ্রেষ্ঠ আর সম্ভবত একমাত্র উপায় নয় ? তার পরিচালকদের জন্য এটা কি খাঁটি উদ্দীপনাদানকারী ও সেবক, অর্থাৎ সকল মানুষের জন্য বিশপ ও পুরোহিত হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ উপায় নয় ? খ্রীষ্টের মত, মণ্ডলী যেন সংলাপ ও বাণীপ্রচার কার্যের মণ্ডলী হয়, যে মণ্ডলী যত মানব বাস্তবতা ও সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে (দ্র: বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী, ১, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা), ন্যায্যতা, সংহতি ও সমগ্র জগতের জন্য সার্বিক মুক্তির মণ্ডলী হয়, নতুন সমাজের মণ্ডলী হয় ! মণ্ডলী যেন ঐশরাজ্যের সকল দলগুলোর সঙ্গে, নতুন সমাজের দলগুলোর সঙ্গে সর্বদা ও সর্বত্র সহযোগিতা করে !

অধ্যায় ১৩

মণ্ডলীর প্রৈরিতিক অগ্রাধিকারসমূহ

সামগ্রিকভাবে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও কাঠামোগত পরিবর্তনের কর্মী হিসেবে ভারতীয় মণ্ডলীর কমই পরিচিতি আছে। দরিদ্র ও দুঃখ-পীড়িতদের জন্য মণ্ডলীর ভাবনার কিছুটা জনগণ মুখোমুখি হলেও, গুটিকয়েক ব্যতিক্রম বাদ দিলে, মানবাধিকার বিষয়সমূহে এবং জনগণের আন্দোলন ও সংগ্রামে তার অংশগ্রহণ খুবই অপ্রতুল। এমনটি দেখা মেলা ভার। কতজন মনে করে, সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষাবলম্বন এবং একটি উত্তম সমাজ প্রতিষ্ঠা মণ্ডলীর ২-৩টি প্রধান ভাবনার অন্যতম ? মণ্ডলী উন্নত নানা কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের অধিকারী, আর সে তার কর্মী ও অর্থসম্পদের অনেকাংশ তার আধ্যাত্মিক, দানশীল, চিকিৎসা ও শিক্ষাধর্মী প্রৈরিতিক কাজের পেছনে ব্যয় করে, তার সামাজিক প্রেরণদায়িত্বের পেছনে নয়। তাই, সামাজিক ক্ষেত্রে মণ্ডলীর কম বিশ্বাসযোগ্যতাই রয়েছে। তার ধারণা ও তার প্রকাশিত আদর্শগুলোর মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিস্তর।

মণ্ডলীর প্রয়োজন এই পরিস্থিতির আমূল উত্তরণ ঘটানোর আর তার প্রৈরিতিক অগ্রাধিকারসমূহ ব্যাখ্যা (ও বাস্তবায়নের) মাধ্যমেই এ কাজটি করা। নীচের আলোকপাতটি এই অধ্যায়ের একটি প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করবে। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, লাতিন আমেরিকার বিশপগণ গুরুত্বারোপ করে বলেছেন যে, মণ্ডলীর কর্মী ও অর্থসম্পদ সাধারণ মঙ্গল আর বিশেষ করে দরিদ্রদের অনুকূলে নিবেদিত হতে হবে। সামাজিক সচেতনতা ও সাধারণ মঙ্গল ভাবনার দাবি হল, একজন যেন ক্ষমতা ও সম্পদ সমাজের কল্যাণে খাটায়। লাতিন আমেরিকার বিশপগণ উল্লেখ করেছেন, 'দীনদরিদ্রদের নিকট মঙ্গলসমাচার প্রচার' করার প্রভুর সুস্পষ্ট আদেশ আমাদের পরিচালিত করবে সম্পদ ও প্রৈরিতিক কর্মী বণ্টনের দিকে, যার অগ্রাধিকারভিত্তিক লক্ষ্য হবে হতদরিদ্র ও সর্বাপেক্ষা অভাবী শ্রেণীর মানুষ এবং যারা কোন না কোন কারণে বিচ্ছিন্ন তারা। 'জগতে ন্যায্যতা' শীর্ষক ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের সিনড দলিলে আরও বলা হয় যে, মণ্ডলী এমনভাবে বসবাস করবে এবং তার নিজ সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করবে, যেন এগুলির মধ্য দিয়ে দরিদ্রদের নিকট সুসমাচার ঘোষিত হয়। এ ধরনের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই মণ্ডলীকে তার কর্মী ও অর্থসম্পদ ব্যবহার করতে হবে।

"মণ্ডলীর প্রৈরিতিক অগ্রাধিকারসমূহ" শিরোনামের এই অধ্যায়ে, প্রথমে আলোকপাত করা হবে অগ্রাধিকারগুলোর গুরুত্বের উপর, যেন মণ্ডলী অত্যন্ত কার্যকরভাবে তার কর্মী ও অর্থসম্পদ ব্যবহার করতে পারে(১)। এরপর এক এক করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হবে দরিদ্রতা(২) ও সামাজিক ন্যায়বিচারের(৩) অগ্রাধিকার সংক্রান্ত এবং মণ্ডলীর তার মানব সম্পদ(৪) ও বস্তুসম্পদের(৫) ব্যবহার সংক্রান্ত বিশপগণের আলোকপাতের উপর। সবশেষে আলোচনা করে দেখা হবে, এ সকল অগ্রাধিকারের আসলে বাস্তবায়ন ঘটানো হচ্ছে কি-না(৬) আর কি করা উচিত(৭)।

১। অগ্রাধিকারগুলোর গুরুত্ব

১৯৭০ এবং ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশপগণ 'অগ্রাধিকারসমূহের অতিশয় গুরুত্ব' স্বীকার করে নিয়েছেন, এ কথার কোন রকম উল্লেখ ছাড়াই। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে, তারা সকলের মঙ্গলের কথা ভেবে মণ্ডলীর সার্বিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণে সি বি সি আই ও সি আর আই-এর মধ্যে ফলপ্রসূপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, তারা আরও বলেছেন : 'সত্যিকার সংঘবদ্ধতার মনোভাব নিয়ে, যে সকল কাজকে আমরা মণ্ডলীর বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অপরিহার্য মনে করি, সেগুলোর জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী ও অর্থসম্পদ প্রাপণীয় করে তোলার লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে ও আগ্রহী হতে হবে।' এ কথা বলার সময় তাদের মাথায় মণ্ডলীর ধর্মপ্রদেশীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় দলগুলোকে শক্তিশালীকরণের ভাবনা থাকলেও, এই নীতিটি মণ্ডলীর সমগ্র প্রেরণদায়িত্বের জন্য মঙ্গলে বিশ্বাস করে।

বাণীপ্রচার সম্পর্কে বলার সময় ("যার দ্বারা বুঝানো হয় সমগ্র মানুষের ও প্রতিটি মানুষের সার্বিক মুক্তি"), বিশপগণ ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আরও বেশী সুস্পষ্ট ছিলেন :

সমগ্র দেশ জুড়ে বাণীপ্রচারের কাজ সম্পন্ন করার জন্য, ভারতীয় মণ্ডলীকে অবশ্যই দেশব্যাপী পরিকল্পনা ও গৃহীত অগ্রাধিকারসমূহের ভিত্তিতে উপস্থিত সকল কর্মী ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ঘটাতে হবে। একে অবশ্যই অধিকতর আত্মনির্ভরতার দিকে অগ্রসর হতে হবে। কর্মীদের সচলতা জরুরীভিত্তিতে প্রয়োজন। সমন্বয়কারী সংস্থাগুলোর (সি বি সি আই-সি আর আই যৌথ কমিটি, ইত্যাদি) বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যে, তিন স্বতন্ত্র (উপাসনা পদ্ধতির) মণ্ডলীর মধ্যে, এবং বিশপ, পুরোহিত, ধর্মব্রতী ও ভক্তসাধারণের মধ্যে সহযোগিতাকে ব্যাপকভিত্তিতে উৎসাহিত করতে হবে....বিদ্যমান কাঠামোগুলো যদি অনুপযুক্ত মনে হয়, তাহলে কর্মী ও সম্পদের অনেক বেশী সন্তোষজনক বণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন অনুসারে কাঠামোগুলো পরিবর্তন-সংশোধন করা দরকার।

নীতিটি সহজবোধগম্য : মাণ্ডলিক কর্মী ও সম্পদ প্রৈরিতিক অগ্রাধিকারসমূহের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। অগ্রাধিকারগুলোকে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সদস্যদের নিয়োগদানসহ কর্মী ও অর্থসম্পদের সঠিক বণ্টনের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে হবে।

২। দরিদ্রদের জন্য ভালবাসার অগ্রাধিকার

আগে যেমনটি বলা হয়েছে, বিশপগণের আলোকপাতের একটি ঘন ঘন ও কেন্দ্রিয় মূলসুর হচ্ছে, গরীবদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক ভালবাসা (দ্র: অধ্যায় ৪.৭ এবং অধ্যায় ৫.৩)। এগুলো পাঠ করে, একজন বুঝবেন যে, এ লক্ষিত দলগুলো বিশপগণের প্রধান ভাবনা : অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দরিদ্র ও প্রান্তসীমার জনগণ (ঝুঁকিপূর্ণ ও কণ্ঠহীন), দলিত ও আদিবাসী, নারী ও শিশু।

কাজেই, বিশপগণের বাস্তব নির্দেশাবলী এ সকল দলের, বিশেষ করে দরিদ্র ও দলিতদের সেবার উপর জোর দেয়। তবে তারা অসংগঠিত শ্রমিকদের কথা এবং কিছু পেশাগত দলের কথা কমই উল্লেখ করেছেন, যেমন ভূমিহীন ও প্রান্তসীমার চাষীগণ, যাদেরকে বিশপগণ তাদের বিশ্লেষণে হতদরিদ্রদের তালিকায় স্থান দিয়েছেন – সম্ভবত কার্যকরভাবে তাদেরকে সাহায্য করাটা তাদের নিকট অনেক কঠিন মনে হয়েছে বলেই।

৩। সামাজিক ন্যায়বিচারের অগ্রাধিকার

বিশপগণ, অনেককে আশ্চর্য করে দিয়ে, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে 'প্রেরণদায়িত্বের একটি বিশেষ প্রকাশ এবং একটি প্রৈরিতিক অগ্রাধিকার' বলে উল্লেখ করেছেন। এই লক্ষ্যের পেছনে ছোটা কঠিন হলেও, বিশপগণ এর উপর গুরুত্বারোপের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ন্যায়বিচার ভাবনা তাদের সামাজিক বিশ্লেষণে, তাদের শিক্ষামূলক দর্শনে ও নানা প্রস্তাবনায়, আইনী সহায়তার উপর তাদের গুরুত্বারোপে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানে, তাদের ধর্মপল্লীর অগ্রাধিকারসমূহে, ইত্যাদিতে অনেক বেশী উপস্থিত। এ ভাবনাটি আর পরিষ্কার হবে যদি ৮, ৯ ও ১০ অধ্যায় পাঠ করা হয় । তবে, যেমনটি বলা হয়েছে (দ্র: অধ্যায় ৩, পৃষ্ঠা ২৮) বিশপগণ ভূমি সংস্কার, কর্মসংস্থান, পরিবেশ সংক্রান্ত বড় বড় বিষয় ও কার্যক্রম, ইত্যাদি গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন।

৪। কর্মী বণ্টন

দরিদ্রদের জন্য ভালবাসা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা যদি অগ্রাধিকার হয়, তাহলে কোন্ প্রৈরিতিক কাজগুলো বিশেষ হওয়া উচিত ? বিশপগণ কি বিভিন্ন প্রৈরিতিক কাজ ও কর্মী বণ্টন সংক্রান্ত অগ্রাধিকারগুলো প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন ?

কোন বিশেষ সময়ে তারা যে প্রৈরিতিক কাজ সম্পর্কেই বলুন না কেন, সেই কাজের জন্য কর্মীর প্রয়োজনীয়তার উপর বিশপগণ জোর দিচ্ছেন বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে তারা যুবকদের, যারা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরে শিক্ষালাভ করেছে, তাদেরকে যোগ্যতাসম্পন্ন উপদেষ্টা ও দক্ষ ধর্মযাজকের সেবা প্রদানের, এবং ফার্মে, কল-কারখানায় ও অফিসে কর্মরত তরুণ-তরুণীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দানের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন (দ্র: অধ্যায় ৮.৬)। তারা শ্রম কমিশনের মাধ্যমে, একটি উত্তম সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় জনগণের সঙ্গে কাজ করার প্রৈরিতিক দায়িত্বে অসংখ্য ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও ভক্তসাধারণকে নিয়োজিত করার আশাও ব্যক্ত করেছেন। তাদের অন্যান্য বিবৃতিতে, তারা জোর দিয়েছেন আন্তধর্মীয় সংলাপ ও ভক্তসাধারণের গঠনের জন্য, পরিবারসমূহ, গণমাধ্যমের সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা উপর।

বিবৃতির কিছু কিছু অংশ অনেক সুস্পষ্ট। 'দেশের আশু চাহিদাগুলোর প্রতি মণ্ডলী সাড়াদান' শীর্ষক তাদের ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের আলোকপাতে, বিশপগণ 'প্রত্যক্ষ' বাণীপ্রচার কার্যকে মণ্ডলীর নিকট ন্যস্ত প্রধান কাজ হিসেবে উল্লেখ

বাক্স নং ১৩/১

মণ্ডলীর প্রধান আহ্বান

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, দক্ষিণ ভারতীয় মণ্ডলী এবং কিছু অন্যান্য 'প্রোটেস্টান্ট' সংগঠন মিলে ব্যাঙ্গালোরে 'মণ্ডলী ও সামাজিক ন্যায়বিচার' শিরোনামে একটি সেমিনার আয়োজন করে। এ সেমিনারের প্রধান বাণী ছিল : আমাদের যুগের বড় বড় মানব বিষয়গুলোর সন্ধান মেলে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে... আজকের ন্যায়বিরুদ্ধ ও অমানবীয় সমাজের পরিবর্তনসাধনে খ্রীষ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করার এর যে দায়িত্ব, তাতে অংশগ্রহণ করবে না বলে মণ্ডলী মনস্থির করতে পারে না। গোটা ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধনের জন্য, না জেনেশুনে কাজ করার মাধ্যমে, যারা বর্তমান ব্যবস্থার শিকার তাদের নিছক সাহায্য করা অব্যাহত রাখা, তা এ সাহায্য যতই অপরিহার্য হোক না কেন, খ্রীষ্টের ভালবাসার পূর্ণতার চূড়ান্ত দাবিদাওয়ার মুখে, অপরাধমূলক দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। নিপীড়িত-নির্যাতিতদের পক্ষ নেওয়া, তাদের ন্যায্যতার সংগ্রামে সামিল হওয়া, মঙ্গলসমাচারীয় নৈতিকতার আলোকে জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত ও একে দরিদ্রদের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালনা করা এগুলোই হল, বর্তমান প্রেক্ষাপটে মণ্ডলীর প্রধান প্রধান আহবান। কেননা, মণ্ডলী ঐশরাজ্য, যে রাজ্যের প্রধান মূল্যবোধগুলো হচ্ছে ন্যায্যতা, শান্তি, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব, সেই তার চিহ্ন হয়ে ওঠার জন্য আহূত।

করেছেন, তবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জগতের রূপান্তরসাধনের উপর গুরুত্বারোপ করা তারা অব্যাহত রেখেছেন। সেই একই বার্তায়, তারা উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিটি অঞ্চল ও ধর্মপ্রদেশের উচিত, যেখানে যেখানে সম্ভব, সময়োচিত অগ্রাধিকারযোগে সাড়া দেওয়া; আর দেশের যত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সকল সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে মণ্ডলীর সম্পৃক্ততা আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ন্যায্যতার জন্য কাজ করার চেয়েও এমনকি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু কিছু অংশ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলে : অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য পরিকল্পিত অগ্রাধিকারসমূহ (দ্র: অধ্যায় ৯.২ ও ৯.৩), এবং সামাজিক প্রৈরিতিক কাজে আত্মসচেতন, প্রশিক্ষণ, সংগঠন এবং যারা দরিদ্র, দলিত এবং আদিবাসী তাদের ক্ষমতায়নের শীর্ষ অগ্রাধিকারসমূহ (দ্র: অধ্যায় ১০.৬.২)। আশা করা হয় সামাজিক সেবাধর্মী কার্যক্রমগুলোও একটি অগ্রাধিকার হিসেবে তফসিলীভুক্ত খ্রীষ্টানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে বেছে নেয় (দ্র: অধ্যায় ৯.৪.৮)।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'দরিদ্রতা ও উন্নয়ন বিষয়ক বিবৃতি'তে, মানব চাহিদাসমূহের প্রতি সাড়াদানের এবং মানব মর্যাদা ও ন্যায়বিচারকে সমর্থন যোগানোর যীশুর প্রেরণদায়িত্ব অব্যাহত রাখা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, বিশপগণ ঘোষণা করেছেন : এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে, মণ্ডলীকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আজকের অনেক প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে পরিবেশের পরিবর্তনসাধন, কাঠামোসমূহের রূপান্তর সাধন, নিত্য নতুন সম্পর্ক ও নতুন নতুন মূল্যবোধ ব্যবস্থা সৃষ্টি, আর সকল মানুষের জন্য পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ও ব্যাপক সুযোগসুবিধার সৃষ্টি, যখন ব্যক্তিগত সেবাকাজ ও ত্রাণকার্যগুলোর তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান, সব সময় বহাল থাকবে। তারা আরও বলেছেন যে, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সঙ্গে এবং (তাদের) মানব ভাইদের সঙ্গে একটি সাময়িক ও শাশ্বত প্রেমের সমাজ, একটি ন্যায্যতায় সুপ্রতিষ্ঠিত আর শান্তির মুকুট পরিহিত জগৎ, স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এটাই তো হল মণ্ডলীর তথা সকল মানুষের লক্ষ্য ও দায়িত্ব।

৫। তহবিলের ব্যবহার

বিশপগণ ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জোর দিয়ে প্রকাশ করেছেন যে, ভক্তসাধারণের মধ্যে যে সকল নারী-পুরুষ স্থানীয় মণ্ডলীর সেবায় নিজেদের নিবেদনে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন তাদের প্রশিক্ষণের জন্য, যেখানেই সম্ভব, ধর্মপ্রদেশীয় তহবিলের বন্দোবস্ত করা। ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা আরও উল্লেখ করেন, দরিদ্র ও হীনাবস্থার মানুষের চাহিদা পূরণে যেন পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ থাকে। এ ব্যাপারে বিশপগণ ২০০২ খ্রীষ্টাব্দে ছিলেন আরও বেশী অকপট : এই উদ্দেশে (অর্থাৎ ভক্তসাধারণের গঠন) ধর্মপল্লীতে ও ধর্মপ্রদেশে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ তহবিলের আলাদা ব্যবস্থা থাকে। যেন ভক্তসাধারণের গঠনের জন্য কেন্দ্রসমূহ গড়ে তোলা আর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উপযুক্ত কোর্সসমূহ পরিচালনা বা আয়োজন করা হয়। যেন দলিত, আদিবাসী ও নারীদের শিক্ষা দিক থেকে ক্ষমতাপন্ন করার লক্ষ্যে মাণ্ডলিক সম্পদগুলো সহজলভ্য করে তোলা হয়।

ভক্তসাধারণের গঠন এবং দরিদ্রদের সেবা সংক্রান্ত বিশপগণের সুপারিশগুলো এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সেবাকাজ, যেগুলো অপর্যাপ্ত হলেও তীক্ষ্ণধী, এগুলো সংক্রান্ত তাদের আলোকপাতগুলো নিশ্চিত দাবি করে মণ্ডলীর

অর্থসম্পদের ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা।

৬। কি করা হচ্ছে?

উপেক্ষিত অঞ্চলগুলোর অনুকূলে, ভৌগোলিক ভিত্তিতে মাণ্ডলিক কর্মী পুনঃবণ্টনে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ সন্দেহাতীভাবে গ্রহণ করা হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ, দেশের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর, এমনকি খ্রীষ্টানদের উপস্থিতি নেই ধর্মপ্রদেশের এরূপ অঞ্চল বা স্থানের হতদরিদ্রদের প্রতি)। বেশ কয়েকটি ধর্মসম্প্রদায় ও কিছু ধর্মপ্রদেশ তাদের কর্মী বণ্টনের উপর আলোকপাতের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে আর কিছু নতুন সেবাকাজের দপ্তর ও সংঘ দরিদ্রদের মাঝে শুরু করা হয়েছে। সামাজিক কাজ ও আইনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য অনেক পুরোহিত ও ধর্মব্রতীদের প্রেরণ করা হয়েছে। আর কিছু 'অবহেলিত প্রৈরিতিক কাজের' উন্নয়নে কয়েকজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপকে অতিশয় সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হল, এগুলো কি বিগত ৩ বা ৪ দশকে মণ্ডলীতে সামাজিক জাগরণ আন্দোলনের সঙ্গে এবং দরিদ্রদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক ভালবাসা সংক্রান্ত তার ঘোষণাগুলোর সঙ্গে খাপ খায়?

সত্যটি হল, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রৈরিতিক খাত বা কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মণ্ডলী আদৌ কোন ঐকমত্যে উপনীত হতে পারেনি। সে তার প্রৈরিতিক অগ্রাধিকারগুলো সুস্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেনি। সমসাময়িক সমস্যাগুলো মোকাবেলার, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এবং সমাজের রূপান্তরসাধনের সর্বাপেক্ষা কার্যকর উপায়ের উপর বিশপগণ যথেষ্টরূপে আলোকপাত করেননি। (বস্তুত:, সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রশ্নগুলো হল : আজকে ভারতে কি কি ধরনের প্রৈরিতিক কাজের সবচেয়ে বেশী সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে? কোন্ কোন্ প্রৈরিতিক সেবাকাজ দুর্বল শ্রেণীগুলোকে সর্বোত্তমভাবে ক্ষমতায়ন করতে এবং সমাজের কাঠামোসমূহের পরিবর্তনসাধনে অবদান রাখতে পারে?)

ফলশ্রুতিতে, প্রকৃতপক্ষে মণ্ডলী সর্বাপেক্ষা দরিদ্র দলগুলোর জন্য এবং সর্বাপেক্ষা অভাবী খাতগুলোয় তার কর্মী (ও অর্থ) নিয়োগ ও বণ্টন করছে না। কিছু কিছু খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ধর্মব্রতী ও যাজকীয় কর্মীদের সংখ্যা অনুপাতহীন, যখন অন্যান্য খাত খুবই অবহেলিত এবং স্বল্প জনবলসম্পন্ন। এইভাবে, মণ্ডলীর প্রৈরিতিক মনোনয়নকে অতি ঘন ঘন বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ ও প্রৈরিতিক কাজগুলোর চাপের উত্তরদানে বাধ্য করা হয়, বাধ্য করা হয় এগুলোর অবিরাম চলমানতা নিশ্চিতকরণে, মণ্ডলীর সম্মান, 'প্রভাব' ও ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাসাধনে, ধর্মপ্রদেশ বা ধর্মসম্প্রদায়গুলোর জন্য অর্থ উৎপাদনে, এমনকি বিত্তশালী ও ক্ষমতাধরদের স্বার্থের সেবা করতে, অথবা বলা যায় স্বতন্ত্র বিশপ, পুরোহিত ও ধর্মব্রতীগণের ব্যক্তিগত দৃঢ় প্রত্যয় ও স্বার্থ আর এমনকি আয়েশ ও নিরাপত্তার (বা ভয়ের) প্রয়োজন মেটাতে।

অগ্রগতিগুলো সীমিত পরিসরের হলেও হতে পারে, কিন্তু তাই বলে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রৈরিতিক খাতসমূহে কর্মী ও অর্থের পুনঃ বণ্টন নিঃসন্দেহে চাহিদা মত নয়। উদাহরণস্বরূপ ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দের এনবিসিএলসি (National Biblical Catechetical and Liturgical Centre) সেমিনারে স্বীকার করে বলা হয় যে, ভক্তসাধারণের গঠনের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি; পুরোহিত ও ধর্মব্রতীদের গঠনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা ও তাদের প্রতি যে পরিমাণ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে তুলনায় ভক্তসাধারণের গঠনে বরাদ্দ খুবই কম। মণ্ডলীর মোট বার্ষিক ব্যয়ের কি পরিমান অংশ দরিদ্রদের জন্য, তা জানাটাও অনেক তথ্যমূলক (আর সম্ভবত: চমকে ওঠার মত)...। তবে পরিমাণটা নিঃসন্দেহে হবে 'খুবই ক্ষুদ্র', সম্ভবত: সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ থেকে খুব বেশী নয়।

কাজেই, সামাজিক ন্যায়বিচার ও দরিদ্রদের সেবার হেতুটি কর্মী ও অর্থের অভাবে জর্জরিত। ভারতীয় মণ্ডলীতে দরিদ্রদের জন্য সুপরিকল্পিত তহবিল সংগ্রহকে যেমন যথেষ্ট উৎসাহ যোগানো হয়নি তেমনি যথাযথভাবে পরিচালনাও যোগানো হয়নি (দ্র: অধ্যায় ১১.৪)। জরুরী অবস্থা বাদ দিলে, কোন কোন সমৃদ্ধশালী ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লী তাদের তহবিল নিয়মিতভাবে দরিদ্র ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীগুলোর সঙ্গে সহভাগিতা করে (যেমনটি করার জন্য বিশপগণ এগুলিকে পরামর্শ দিয়েছেন, দ্র: অধ্যায় ১০.৬.৮)? আর আমাদের ধর্মপল্লীগুলোর মধ্যে কি পরিমাণ সহভাগিতার ঘটনা ঘটছে? বিশপগণের বিবৃতিগুলোতে সর্বোপরি বলা হয়নি আমাদের বিনিয়োগগুলো কোথাও খাটাতে হবে, কিভাবে আমাদের জমিজায়গা ও যাবতীয় সম্পদ লোকদের জন্য, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের জন্য অনেক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারে, আর কোন কোন প্রৈরিতিক খাতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে আমাদের অর্থ ব্যবহার করা উচিত? উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষাখাতে না সামাজিক প্রৈরিতিক সেবাকমূলক কাজে মণ্ডলীর বেশী অর্থ ব্যয় করা উচিত, সে ব্যাপারে, আর ভক্তসাধারণের মধ্যে যারা ধর্মপ্রচারক

তাদের কর্মসংস্থানের জন্য তার তহবিল বৃদ্ধি করা উচিত না ভবন নির্মাণে তার তহবিল কমিয়ে আনা উচিত, সে ব্যাপারে তারা কোন কিছু বলেননি।

৭। কি করা উচিত ?

কাজেই কি করা উচিত ? প্রথমত:, সি বি সি আই এবং সকল ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে মাণ্ডলিক কর্মী ও অর্থ ব্যবহারে প্রৈরিতিক অগ্রাধিকারসমূহ ও এগুলোর বাস্তব ফলাফলগুলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার করে নেওয়ার তাদের প্রচেষ্টাকে জোরদার করতে হবে। এই লক্ষ্যে সি বি সি আই-এর একটি জেনারেল বডি মিটিং অনতিবিলম্বে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। যাজকীয় ও ধর্মব্রতী কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগদান, এবং প্রাণবন্ত প্রৈরিতিক কাজের লক্ষ্যে অনেক ভক্তসাধারণের নিয়োগদান সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। কোন প্রৈরিতিক সেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য কাউকে জোর করা যাবে না, তবে সঠিক প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা এবং আগ্রহ জাগিয়ে তোলা ও একে সম্মান করা যেতে পারে। সব ধরনের নিয়োগের আগে ব্যাপক আলোচনা বা পরামর্শ কাজ সারতে হবে। সামাজিক দিকে দিয়ে নিবেদনপ্রাণ, আগ্রহী আর সক্ষম পুরোহিত ও ধর্মব্রতীদের অনেক প্রাসঙ্গিক ও অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রৈরিতিক সেবাকাজে সম্পৃক্ত হওয়ার অনুমতি প্রদান ও উৎসাহিত করতে হবে।

প্রতিটি ধর্মপল্লী ও কেন্দ্রে থাকতে হবে পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন ধর্মপ্রচারকদের একটি দল, আর থাকতে হবে অল্প কয়েকজন ভক্তসাধারণ যারা পারিশ্রমিক বা স্বেচ্ছা ভিত্তিতে কাজ করবেন (দ্র: অধ্যায় ১১.৩ এর শেষের আগের অনুচ্ছেদ)। এইভাবে, নতুন নতুন সেবাদপ্তর, কেন্দ্র ও সমাজ ও কার্যক্রমের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে, এগুলোর উন্নয়ন ঘটাতে আর এগুলোকে পরিচালনা যোগাতে হবে (দ্র: অধ্যায় ১১.৩)। নিবেদনপ্রাণ ভক্তসাধারণ, আর সেই সাথে অন্যান্য ধর্মের কিছু ব্যক্তি, এদের সকলকে নতুন নতুন সম্পৃক্ততা শুরু করার জন্য গড়ে তুলতে ও উৎসাহিত করতে হবে। উপরে যেমনটি প্রস্তাব করা হয়েছে, প্রতিটি অঞ্চল ও ধর্মপ্রদেশে একটি করে ন্যায্যতা, শান্তি ও উন্নয়ন (JPD) কমিশন গড়ে তুলতে হবে, যার কাজ হবে সামাজিক সেবাকাজকে অনুপ্রাণিত ও সমন্বিত করা আর এইভাবে মণ্ডলীকে সক্রিয়-সক্ষম করে তোলা যেন সে তার সামাজিক সেবাকাজ সম্পন্ন করতে পারে। অধিকন্তু, দক্ষ আর নিবেদিত ভক্তসাধারণ, পুরোহিত ও ধর্মব্রতীগণকে অবশ্যই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি ও নিয়োগ দিতে হবে, যেন তারা খ্রীষ্টের নামে কথা বলতে ও কাজ করতে পারেন।

বক্স নং ১৩/২

ন্যায্যতার জন্য তীব্র বাসনা গড়ে তোলা

অভিমতের জন্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে, এক বন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন : "আমার শুধুমাত্র একটি বড় প্রস্তাব। আমি মনে করি, মণ্ডলী যেন তার সামাজিক প্রেরণদায়িত্বে শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকে, এটা নিশ্চিত করার জন্য একটি সর্বদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বা পদ্ধতি হচ্ছে সেমিনারীয়ান, ধর্মব্রতী ও ভক্তসাধারণের একটি বলিষ্ঠ, স্থায়ী আর বাস্তবমুখী প্রাথমিক গঠনদান। সকলকে তাদের নিজ নিজ আহবানকে ন্যায়বিচার ও সঠিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সেই একই কাজ করতে সকলকে উদ্দীপিত করার জন্য একটি আহবান হিসেবে বুঝতে হবে।"

"অধিকাংশ গঠন কার্যক্রম এটা থেকে বঞ্চিত। এ গঠন কার্যক্রমগুলো ভক্তদের গঠন করে প্রধানত: পালকীয় সেবাকাজের জন্য, আর পরে এগুলো আশ্চর্য হয় যখন দেখে যে, গঠনলাভকারীগণের সামাজিক সেবাকাজে অংশগ্রহণ ঘটছে না। এমনকি কিছু ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মসম্প্রদায় সামাজিক ন্যায়বিচারমূলক সেবাকাজের পক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করলেও, তাদের গঠন কার্যক্রমগুলো অনেক সময় খুবই ত্রুটিপূর্ণ রয়ে যায়। মণ্ডলীতে যারা অন্যদের উদ্দীপনা যোগাবেন, তাদের মধ্যে আমাদের গড়ে তুলতে হবে ন্যায্যতার জন্য তীব্র বাসনা। আমি এমনকি বলতে চাই, পুরোহিত, ধর্মব্রতী ও ভক্তসাধারণ মণ্ডলীতে ধর্মপ্রচারক হিসেবে গৃহীত হন না, যদি তারা সেই বাসনার বহিঃপ্রকাশ না ঘটান। শেষ পর্যন্ত, সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসী ও মানুষকে অবশ্যই ন্যায্যতার জন্য এই তীব্র বাসনায় পরিপ্লুত হতে হবে।"

তাই, ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীগুলো, এবং বিশপ, পুরোহিত, ধর্মব্রতী ও ভক্তসাধারণগণ, সকলেই মণ্ডলীর প্রৈরিতিক অগ্রাধিকারগুলো অধিকতর সুষ্ঠুভাবে প্রাণময় করে তুলবেন। বিশপগণ ধর্মপ্রদেশকে, পুরোহিতগণ ধর্মপল্লীকে অনুপ্রাণিত করবেন, আর খ্রীষ্টবিশ্বাসী ভক্তসাধারণ মণ্ডলীতে ও সমাজে তাদের ভূমিকা অনুযায়ী জীবনযাপন করবেন। আর ধর্মপল্লী (ও ধর্মপ্রদেশ) তাদের অগ্রাধিকারগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাবে। প্রকৃতপক্ষে, সকল ধর্ম ও মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ একসাথে মিলে ঐশরাজ্যের ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার অগ্রাধিকারগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাবেন।